অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে পর্তুগিজদের আগমন এবং এতদঞ্চলীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। খ্রিস্ট জন্মের বহু পূর্ব থেকে এশিয়ার এ অঞ্চল দুটো কৃষি ও শিল্পে (কুটির শিল্প) বিকাশ লাভ করেছিল। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এতদঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাণিজ্যকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছিল। উত্তরে মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ, পূর্বদিকে চীন, জাপান এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। তবে আবহমানকাল থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহির্বাণিজ্যের বড় অংশীদার ছিল ইউরোপ। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলোর মাধ্যমে এশিয়ার পণ্যসামগ্রী ইউরোপীয় দেশসমূহে প্রেরিত হত। সিন্ধু উপত্যাকা থেকে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর-কৃষ্ণ সাগর হয়েও ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য পরিচালিত হত। তবে পর্বতশঙ্কুল এ পথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতির জন্য বণিকরা এ পথটি খুব কম ব্যবহার করত। সুলতানি ভারতে (১২০৬-১৫২৬ খ্রি.) সিন্ধুর এ স্থলপথটির মাধ্যমে মধ্য এশিয়া, মেসোপটেমিয়া (ইরাক), পারস্য (ইরান), তুর্কিস্তান এবং হিমালয় পবর্তের পাদদেশে অবস্থিত নেপাল, ভুটান, আসাম প্রভৃতি দেশগুলোর বাণিজ্য চলত। মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যগুলোতে বাংলার বিভিন্ন দেশে বাঙালি বণিকদের ডিঙ্গার[১] বহর নিয়ে শ্রীলংকা এবং করমণ্ডল উপকূলীয় বন্দরগুলোতে ব্যাপকভাবে যাতায়াতের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[২]

ইউরোপে প্রেরিত বাণিজ্যপণ্যের মধ্যে মশলা, মসলিন, সুতি ও রেশম বস্ত্র, সুগন্ধী কাঠ, মূল্যবান পাথর, চীনামাটির সৌখিন জিনিসপত্র প্রভৃতি রপ্তানি হতো। ইউরোপ থেকে আসতো কাঁচের জিনিসপত্র, সীসা ইত্যাদি। তবে ভারতীয় বণিকরা রপ্তানিকৃত পণ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণে অধিক

---

[১] বাংলাদেশে মধ্যযুগে বড় বড় নৌকাগুলোকে ডিঙা বলা হত।

[২] Dinesh Chandra Sen, ed., *Vanga Sahitya Parichaya or Selections from the Bengali* Literature (Kolkata : University of Calcutta, 1914), pp. 201, 232 - 245.

উৎসাহী ছিল। অপরদিকে বিদেশী বণিকদের পণ্যের বিনিময়ে পণ্যই দিতে চাইত, স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা সহজে দিতে চাইত না। এভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সরবরাহ হত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের উল্লেখ করেন, ভারতীয় বণিকরা সোনা দিয়ে দাম শোধ না করে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিতেই অভ্যস্ত বেশি। তাঁরা পণ্যের পসরা নিয়ে জাহাজে করে দেশে-বিদেশে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং সেই জাহাজে তাল-তাল সোনা বোঝাই করে দেশে ফিরেন। পণ্যের বদলে পণ্য দিয়ে তারা বাণিজ্যের ঋণ পরিশোধ করেন। সাধারনত সোনা দিতে চান না।[৩] বার্ণিয়েরের এ বক্তব্য থেকে সপ্তদশ শতকেও 'পণ্য প্রদান, স্বর্ণ গ্রহণ' ভারতের এ বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত ছিল তা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপের সঙ্গে এশীয় বাণিজ্যের প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিল আরব বণিকরা। তারা ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় ক্যাম্বে, কালিকট, কুইলন প্রভৃতি বন্দর থেকে মশলা ও অন্যান্য পণ্য সংগ্রহ করে মধ্যপ্রাচ্যের কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, এন্টিয়ক, আলেপ্প, ত্রিপলি প্রভৃতি মুসলিম নগর ও বন্দরে নিয়ে যেত। ফ্রাঙ্ক (ফরাসি), ইহুদী (ফ্রান্সের ইহুদী), জেনোয়া, ভেনিস, ফ্লোরেন্স এর বণিকরা মুসলিম বণিকদের কাছ থেকে প্রাচ্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করত। একাদশ শতাব্দী থেকে সংঘটিত ক্রুসেডের ফলে ভূমধ্যসাগরতীরবর্তী প্রাচ্য বাণিজ্যের নগর ও বন্দরগুলোতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে পণ্য সরবরাহ হ্রাস পায়।

রোমান পোপের প্রাচ্য সামগ্রী বর্জনের আহ্বানও ইউরোপে প্রাচ্যের পণ্য হ্রাসের অন্যতম কারণ ছিল। পোপের আহ্বানে ইউরোপীয় বণিকরা প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করে দিলে এশীয়-ইউরোপীয় বাণিজ্যে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। তবে ইটালির বণিকদের মাধ্যমে বিশেষত ভেনিসের মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভেনেসীয় বণিকরাও ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করেছিল এবং জাহাজ দিয়ে ক্রুসেডার ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করেছিল। কিন্তু তারা কেবল ধর্মীয় উন্মাদনার জন্য প্রাচ্যের সংগে স্থাপিত বাণিজ্য স্বার্থ স্থায়ীভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা পোপের আহ্বান প্রত্যাখান করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম নগর ও বন্দরগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে

---

[৩] Francois Bernier, *op. cit.*, p. 204.

এবং মুসলিম রাজ্য ও নগর প্রধানদের সঙ্গে বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে।[৪] ভেনেসীয়রা আলেকজান্দ্রিয়ায় তাদের বাণিজ্যিক কর্মকান্ড দেখাশুনার জন্য সেখানে একজন কনসাল পর্যন্ত নিয়োগ করে।[৫] এভাবে প্রাচ্য বাণিজ্যে ভেনিসের ব্যাপক অংশগ্রহণের পথ তৈরি হয়।

এয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে ভেনিসের শক্তি ও আধিপত্য প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে চতুর্থ ক্রুসেড[৬] শুরু হলে ভেনিসের সামনে বিরাট সুযোগ চলে আসে। ভেনিসের বণিকরা চতুর্থ ক্রুসেডে জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে বটে, কিন্তু মিশরের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার কারণে তারা মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। পথিমধ্যে ভেনেসীয় বণিকদের প্ররোচনায় ভেনিসের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী জারা শহরটিকে ক্রুসেডারেরা ধ্বংস করে দেয়।[৭] মিশরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ভেনেসীয় বণিকরা ১২০৪ খ্রি. পথিমধ্যে অতি সুকৌশলে জাহাজের গতি পরিবর্তন করে জাহাজগুলোকে কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে চালিত করে। ধর্মোন্মাদ ক্রুসেডাররা বহুদিনের সমৃদ্ধ এবং সুন্দরী নগরী কন্সট্যান্টিনোপলকে একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে।[৮] ক্রুসেডাররা কন্সট্যান্টিনোপল ধ্বংস করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাইজানটাইন সম্রাটকে পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত করে। বাইজানটাইনীয়দের ক্ষমতাচ্যুতির পর সমগ্র ভূমধ্যসাগরে ভেনিসের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। তারা মুসলিম নগর ও বাণিজকেন্দ্রগুলো হতে প্রাচীয় পণ্যাদী সংগ্রহ করে নিজস্ব জাহাজে বহন করে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, হলান্ড প্রভৃতি দেশে সরবরাহ করতে থাকে এবং বিপুল পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে থাকে। অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্যে ভেনিস সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু হতে বিভিন্ন কারণে প্রাচ্যের দেশগুলোতে ইউরোপীয়দের আগমন শুরু হয়। পশ্চিম এশিয়ার আরব শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রুসেডে বর্বর মঙ্গোলদের সমর্থন লাভ এবং

---

[৪] Auguste Tousaint, *op. cit.*, p. 88.

[৫] *Ibid*

[৬] ১২০২ ১২৬৮ খ্রি. পর্যন্ত চতুর্থ ক্রুসেড স্থায়ী হয়।

[৭] নূরুন নাহার বেগম, আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

[৮] তদেব, পৃ. ৬৫-৬৬।

সেসঙ্গে মোঙ্গলদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণের লক্ষ্যে খ্রিস্টান পোপ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো চীনে বিভিন্ন মিশন প্রেরণ করেন। এরই পটভূমিতে নিকোলোপোলো, মার্কোপোলো, রুব্রিকুইশ, নিকোলো ডি কন্টি প্রমুখ পর্যটক ও ধর্মপ্রচারকদের চীনসহ এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে পদার্পন ঘটে। ইউরোপীয় পর্যটক ও ধর্ম প্রচারকদের পক্ষে মোঙ্গলদের কিছুটা খ্রিস্টধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হলেও চীনে এবং মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য মোঙ্গলদের সহযোগীতা লাভ করা ইউরোপীয়দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এতদঞ্চলের সম্পদ ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ ও মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন তা ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাচ্যের ভূস্বর্গ ভারতবর্ষ (দক্ষিণ এশিয়া) এবং মসলাসমৃদ্ধ অঞ্চল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) সম্পর্কে প্রচন্ড আগ্রহের সৃষ্টি করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যে অটোমান তুর্কিদের উত্থান ইউরোপীয়দের প্রাচ্যে আগমনের বিশেষ পটভূমি তৈরি করে। অটোমানদের রাজ্য জয়ের আকাঙ্খায় এশিয়া মাইনর ও পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপকভাবে যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়লে প্রচলিত ভূমধ্যসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরীয় পথে প্রাচীনকাল থেকে পরিবাহিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্য সংকটের মুখে পড়ে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমানদের হাতে কন্সট্যান্টিনোপলের পতন ঘটলে সেখানে বাণিজ্যরত জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, মিলান, জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকরা কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে তাদের বাণিজ্য গুটিয়ে নিয়ে স্বদেশে চলে গেলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্য মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

এসময় একমাত্র ভেনিস অটোমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু অটোমানদের অত্যধিক মুনাফা অর্জনের কারণে প্রাচ্য পণ্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে ইউরোপীয়দের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অথচ ইউরোপীয় জনগণ মশলার ব্যবহারে এমনভাবে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল যে কোনোভাবে এর ব্যবহারও পরিত্যাগ করতে পারছিল না। এদিকে প্রাচ্যের সঙ্গে স্থাপিত মশলা বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলো প্রচন্ড অসহিষ্ণু বোধ করছিল এবং এশিয়ার মশলার দেশগুলোতে আসার পরিকল্পনা করে। ইতিমধ্যে রেনেসাঁর প্রভাবে ইউরোপীয়দের ভৌগলিক জ্ঞান বৃদ্ধি, সমুদ্র যাত্রার জন্য শক্তিশালী জাহাজ, কম্পাস, মানচিত্র প্রভৃতির আবিষ্কার ইউরোপীয়দের প্রাচ্য আগমনের আকাঙ্খাকে আরো প্রবল করে। উল্লিখিত পটভূমির ধারাবাহিকতায় ভাস্কো দা গামা নামক পর্তুগিজ নাবিক ও নৌ-অধ্যক্ষ জলপথে লিসবন থেকে অগ্রসর হয়ে

উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে ইউরোপীয়দের প্রাচ্য আগমনের আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেন।

ভারতে এসেই পর্তুগিজরা প্রাচ্য বাণিজ্যে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরব বণিকদের হটিয়ে সেখানে একক আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পায়। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা প্রচণ্ড মুসলিম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, অন্যদিকে মালাবার উপকূলীয় কোচিন, ক্যানানোর, কুইলন প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ভারতবর্ষে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য তারা গোয়া, দিউ, দমন, বেসিন, সলসেট প্রভৃতি বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় বন্দর ও রাজ্যগুলো পর্তুগিজরা দখল করে নেয়। তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র মালাক্কাও দখল করে নেয়। অস্ত্র ও রণতরীর জোরে পর্তুগিজরা শ্রীলংকা, বাংলা, বার্মা, পেগু, আরাকান, থাইল্যান্ড, বোর্ণিও, মলুক্কাস প্রভৃতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বিভিন্ন রাজ্য ও বন্দরের উপর একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিটি দেশের সঙ্গে পর্তুগিজরা তাদের অনুকূলে চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে তারা সমগ্র প্রাচ্য বাণিজ্যে একচেটিয়া বাণিজ্যবলয় প্রতিষ্ঠা করে।

পর্তুগিজরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকে অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পর্তুগিজরা মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ, জাহাজ লুণ্ঠন, শারিরীকভাবে নির্যাতন, হত্যা প্রভৃতির ন্যায় যেমন বিভিন্ন অন্যায়-অমানবিক নীতি গ্রহণ করেছিল তেমনি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও তারা একইভাবে অসহিষ্ণু নীতি অবলম্বন করেছিল। জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা, হিন্দুদের মন্দির ও মুসলমানদের মসজিদ ধ্বংস করা, তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন ও ঘৃণা প্রকাশ করা, বিচারসভা স্থাপনের মাধ্যমে হিন্দুদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা অথবা তাদের অর্থসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি ঘৃণ্য ও মানবতাবর্জিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষে পর্তুগিজ খ্রিস্টানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা মিশ্র বিবাহ প্রথা বা ভারতীয় রমণী বিবাহ করার রীতি প্রবর্তন করেছিল।

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজদের প্রায় দেড়শত বছরের অবস্থান এতদঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অবস্থাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। পর্তুগিজদের উত্তমাশা হয়ে ভারতে আগমনের পর থেকে গোয়া-লিসবন পথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যোগাযোগের প্রধান পথে পরিণত হয়েছিল। ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে মুসলিম তথা এশীয় বণিকদের আধিপত্যের অবসান এবং পর্তুগিজদের তথা

ইউরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের অবস্থানকালীন পর্যন্ত আর কখনো এশীয়বাসীরা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। পর্তুগিজদের পতন ঘটিয়ে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইংরেজরা মালাক্কা (মালয় ভূখণ্ড), শ্রীলংকা ও ভারতবর্ষে বাণিজ্য আধিপত্যই প্রতিষ্ঠা করেনি, ক্রমানুয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাও হস্তগত করে এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখে।

পর্তুগিজদের আগমন ও এক শতাব্দীর অধিককাল অবস্থান দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ঠিকই, তবে পর্তুগিজ বাণিজ্যের বহু ইতিবাচক দিকও স্পষ্টত লক্ষ্যণীয়। পর্তুগিজরা ক্রমানুয়ে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছিল। যুবরাজ খুররম (পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দাক্ষিণাত্য থেকে যখন বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন হুগলির পর্তুগিজ সৈন্যরা তার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। স্থানীয় রাজাদের ও জমিদারদের সৈন্যবাহিনীতে তারা নিয়মিত সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করত। ফ্রেডারিক ডুডলি ফ্রানসিসকো, রড্ডা ও আনার্বাস পেড্রো নামে তিনজন পর্তুগিজ রাজা প্রতাপাদিত্যের গোলন্দাজ সৈন্য ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়।[৯] এমনকি রড্ডা প্রতাপাদিত্যের পক্ষে যুদ্ধ করে একটি মোগল বাহিনীকে পরাজিত পর্যন্ত করেন।[১০] তাদের প্রভাব ক্রমানুয়ে এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত। বাঙালি কবি দ্বিজরামদেব কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন উপলক্ষে পর্তুগিজদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে বর্ণনা করেন-

ফেরাঙ্গি বান্ধিল টঙ্গি গোলন্দাজ তার সঙ্গী
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাট।
দ্বিজরামদেব ভণে সারদা ভাবিয়া মনে
নগর পত্তন গুজরাট।[১১]

---

[৯] শ্রাবণী বসু, "ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্য-ইউরোপীয়দের ভাবমূর্তি", ই. অ. -৩, ১৯৮৮, পৃ. ১১২।

[১০] *তদেব।*

[১১] শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* ৬ষ্ঠ সং. (কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কো. প্রা. লি., ১৯৭৫), পৃ. ৫৪২।

পর্তুগিজ বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পর্তুগিজদের মাধ্যমে কম মূল্যে ইউরোপে মশলার সরবরাহের ফলে সেখানে এর ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি হয় । সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলার উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পর্তুগিজদের বাণিজ্যক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের ফলে কেবল মশলার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি, বস্ত্র, নীল, শোরা প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তবে পর্তুগিজরা পণ্য উৎপাদক, কৃষক বা ভূমির মালিকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ না করায় উৎপাদনকারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত মূল্য পেতো না। সুতরাং পর্তুগিজ আমলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পণ্যের উৎপাদন বাড়লেও সাধারণ জনগণ উহার প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মূলত দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে ঐ অর্থ চলে যায়।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে পর্তুগিজদের বিভিন্ন অবদান লক্ষ্য করা যায়। পর্তুগিজ খ্রিস্টান এবং ভারতবংশোদ্ভূত খ্রিস্টান শিশুদের ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা দানের জন্য গোয়া, কোচিন, ক্যানানোর, কুইলন প্রভৃতি উপকূলীয় শহরগুলোতে তারা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এসব স্কুলে ভারতীয়দের বিশেষত স্থানীয় হিন্দুদের প্রবেশাধীকার ছিল। পরবর্তীকালে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকদের অনুসরণ করে অথবা ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদকে অধিক জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রস্টেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ ব্যাপকভাবে মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এভাবে পর্তুগিজরা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সুত্রপাত ঘটানোর মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পর্তুগিজরা তামিল ও বাংলা ভাষায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করে। কিন্তু তাদের রচিত গ্রন্থগুলো খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য যতটা না খ্যাতি অর্জন করে তার থেকে গদ্য সাহিত্যের পথ প্রদর্শক হিসেবে অনেক বেশি অবদান রাখে। তামিল ও বাংলা ভাষায় আধুনিক রীতিতে প্রথম ব্যাকরণ রচনা করে এ শাস্ত্রের উন্নতি বিকাশের পথকে তারা সুগম করেছিল। পর্তুগিজরাই প্রথম গোয়াতে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেছিল।

কথোপকথন, বাণিজ্যিক লেনদেন, সামাজিক মেলামেশা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচুর পর্তুগিজ শব্দ তামিল, বাংলা, হিন্দি, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় সরাসরি বা অপভ্রংশ আকারে অনুপ্রবেশ করে। আলকাতরা, আলপিন, আনারস, আতা, আচার, আলমারি, আয়া, ইস্পাত, ইস্ত্রি, কম্পাস, কাজুবাদাম, কাপ, কামিজ, কার্তুজ, কামান, কুঠি, ক্যাথলিক, গুদাম, গির্জা, মিশন, চকলেট, চাবি, জানালা,

জ্যাকেট,জুয়া, জুলাপ, তোয়ালে, তুফান, নিলাম, পাঁওরুটি, পেঁপে, পিয়ারা, পিয়ন, পেরেক, ফ্যাক্টরি, ফিতা, বয় (চাকর), বারান্দা, বালতি, বাসন, বিস্কুট, বোতাম, মিস্ত্রি, রশিদ, লেবু, সাবান, সালাদ, সায়া, সোফা প্রভৃতির ন্যায় বহু পর্তুগিজ শব্দ আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি[১২]। দেখা যায় প্রায় ৫০০ পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৩] ভারতের চিত্র শিল্পে পর্তুগিজদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল।[১৪]

পর্তুগিজরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন নতুন নতুন ফলমূল ও কৃষিজাত পণ্যের প্রবর্তক ছিল। তারা আমেরিকা মহাদেশ থেকে তামাক, আনারস, পেঁপে, কাজু বাদাম, মিষ্টি আলু, লাল মরিচ (চিলি) প্রভৃতির আমদানি করে।[১৫] চাষাবাদ ও উৎপাদনের মাধ্যমে এগুলো এতদঞ্চলের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। পর্তুগিজরা এসব পণ্য সম্ভবত বাণিজ্য পণ্য হিসেবে সুদূর আমেরিকা থেকে এশিয়া অঞ্চলে নিয়ে এসেছিল। তারা বাণিজ্য পণ্য হিসেবে কেবল ভিন্ন মহাদেশ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন ফলমূলের আমদানি করেনি, পাশ্ববর্তী এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বিভিন্ন ফলমূল নিয়ে আসে। এ ধারাবাহিকতায় পর্তুগিজদের মাধ্যমে চীন থেকে লিচু ও মিষ্টি কমলার আমদানি ঘটে এবং এতদঞ্চলের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়।

পর্তুগিজরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে স্থানীয় লোকদের প্রতি বিভিন্ন অসহিষ্ণু নীতি গ্রহণ করেছিল বটে, তবে একথা স্বীকার্য যে তাদের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে পৃষ্টপোষকতা লাভ করে। পশ্চিম ভারতের উপকূলীয় এবং ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় ক্যাথলিক খ্রিস্টীয় মতবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। উল্লেখ্য যে পর্তুগিজরা রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টীয় ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস ছিল। পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে এখনও বহু ক্যাথলিক খ্রিস্টান বসবাস করে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলাতে বহু ক্যাথলিক গির্জার অবস্থান এবং সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ভক্তদের আগমন লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম

---

[১২] S. Jeyaseela, *op. cit.*, p. 345; J. J. Campos, *op. cit.*, pp. 214-225.

[১৩] *Collins English-Portuguese Português-Inglês Dictionary*, eds., John Whitlam, Witoria Davies and Mike Harland, Second edition, Great Britain : Harper Collins Publishers, 2001.

[১৪] J. B. Harrison, *op. cit.*, pp. 44-45.

[১৫] A. L. Basham, *op. cit.*, p. 341.

বাংলার ব্যান্ডেল গির্জার কথা উল্লেখ করা যায় (পরিশিষ্ট পত্রে ব্যান্ডেল গির্জার স্থাপনের তারিখ সম্বলিত একটি ছবি সংযোজন করা হল, চিত্র নং - ৪)। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ক্যাথলিক মতাবলম্বী লোক ছাড়াও গির্জাটির নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার জন্য এখানে বহু লোকের সমাগম ঘটে থাকে যা গবেষক নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজদের বাণিজ্য পরিচালনা এবং অবস্থান সম্পর্কিত একটি দিকে দৃষ্টিপাত না করলেই নয়। পর্তুগিজরা কখনো প্রাচ্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করতো না। প্রাচ্য বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাণিজ্যিক দিক থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও রাজ্যগুলো দখল করেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। তাছাড়া একই উদ্দেশ্যে ভারতের উপকূলীয় কালিকট (পরবর্তীতে কালিকটের সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে), কোচিন, ক্যানানোর, কুইলন, বাংলা, শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, বোর্ণিও, মলুক্কাস, চীনের ম্যাকাও এবং জাপানের নাগাসাকি পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ও বন্দররাজ্যের সঙ্গে তারা মিত্রতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু পর্তুগিজদের অনুসরণ করে স্পেনীয়, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রমুখ যেসব ইউরোপীয় জাতি প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশগ্রহণের জন্য প্রাচ্যে আগমন করে তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এতদঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্খা জেগে উঠে। এক পর্যায়ে স্পেনীয়রা ফিলিপাইনে, ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইংরেজরা মালয় ভূখন্ডে, শ্রীলংকায় এবং ভারতবর্ষে স্থানীয় শাসকদের পরাজিত করে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক শাসন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপীয় জাতিগুলো একচেটিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করে যে বিপুল মুনাফা অর্জন করতো তার সবই স্বদেশের প্রেরণ করতো। এভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থশোষণের মাধ্যমে তারা নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পথকে ত্বরান্বিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাছাড়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আধুনিক শিক্ষা, বিচার, প্রশাসন, রাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ, শিল্প প্রভৃতির বিকাশে স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। যেহেতু পর্তুগিজদের পথ ধরে ঐসব ইউরোপীয় জাতির এশিয়ায় আগমন ঘটেছিল সেহেতু এক্ষেত্রেও পর্তুগিজদের পরোক্ষ অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

এভাবে দেখা যায়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যে একক এবং একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরে আবহমানকাল থেকে বাণিজ্যরত আরব, গুজরাটি, করমণ্ডল উপকূলীয় এবং বাঙালি বণিকদের উপর বর্বরোচিত আচরণ করেছিল এবং তাদের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল, বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপকূলীয় এবং মুসলিম প্রভাবিত রাষ্ট্র দখল করে নিয়েছিল, খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে অসহিষ্ণুতার চরম পরাকোষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল, জলদস্যুতা, নারীহরণ, দাসব্যবসার ন্যায় জঘন্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছিল। তবে এতদঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয় ছিল। বিশেষকরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে, গোয়া ও অন্যান্য পর্তুগিজ প্রভাবিত উপকূলীয় নগরগুলোর সমৃদ্ধি সাধনে, ভারতের উপকূলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় ভাষাগুলোর উন্নয়নে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আমদানিকৃত নতুন নতুন ফলমূলের-চাষাবাদের ব্যবস্থাকরণ এবং জীবনযাত্রায় বিভিন্ন রীতিনীতির প্রচলনে তাদের অবদানকে কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না।